OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 204 - 210
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 204 - 210
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

‘অশ্রুমঙ্গল’ : নারীর শাশ্বত প্রেমক্ষুধার অন্বেষণ

জিনিয়া পারভিন
গবেষক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : jiniaparveen1988@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Woman's inner voice, Polygamy, Illicit love, Homosexual love, Patriarchy, Narratives, Extramarital relationship.

Abstract
The post-independence writer Afsar Ahmed has presented the ‘inner voice’ of Muslim women in his fiction. His ‘Ashrumangal’ is a novel written on social life of Muslim women. The author has beautifully depicted the biographies of marginalized muslim women in this novel. Apart from that, the novelist has also highlighted the aspects of social problems such as polygamy, illicit love, homosexual love etc.

The four women of Muslim society are Badran, Lalman, Manowara and Hafeza, are oppressed by the patriarchy. The different problems and crises of their lives have been coinaged in his narratives. In the pride of being deprived of love, Hafeza wants to cover the flames of her love with ashes. But how long? So, she had to tasted Nader’s love and wanted to have an extramarital relationship with him instead of getting married. But his dream also disolved due to the cruelty of the society. Her husband Muharram wants to rescue her agian. The novelist explored the eternal love and linguishment of four heroines in this novel. But he could not pave the way for the settlement of charity and Their life and desire remain tearful.

Discussion

স্বাধীনতা উত্তর কালের লেখক আফসার আমেদ মুসলিম সমাজের, বিশেষ করে মুসলিম নারীর অন্তঃপুর ও অন্তঃস্বরকে বাংলা কথাসাহিত্যের আখ্যানের প্রতিবেদনে অত্যন্ত সুনিপুণ দক্ষতায় উপস্থাপন করেছেন। মুসলিম সমাজের মোল্লাগিরি ও শরিয়তি বিধানের প্রকৃত সত্যকে উপন্যাসের আখ্যানে তুলে ধরেছেন। শরিয়তি কানুনের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করে মুসলিম সমাজের ভণ্ড ও মুনাফেক পুরুষ সমাজের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। তিনি উপন্যাসের আখ্যানে দেখিয়েছেন ধর্মের বিধানের নামে যে ফতোয়া দেওয়া হয় তার অধিকাংশই মনগড়া, ধর্মগুরুদের গোঁড়ামি, অশিক্ষা ও রুচিহীনতার পরিচয়। আফসার আমেদ মুসলিম ধর্মকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাননি, ধর্মের গোঁড়ামি ও সংস্কারকে বাস্তবসম্মত করে উপন্যাসের আখ্যানে তুলে ধরেছেন। এক সময় মুসলিম নারীরা তাদের বসবাসের চারপাশের বনজঙ্গল থেকে গাছ, শেকড়, জড়ি-বুটি সংগ্রহ করে প্রাথমিক চিকিৎসার সূচনা করেছিল। মেয়েদের নরম আঙুলে ক্ষতস্থান সেলাই এবং ড্রেসিং-এর মাধ্যমে একসময় নারী শল্যচিকিৎসকেরও অংশ হয়ে ওঠে। এভাবে প্রচীন যুগ থেকে নারী শিক্ষায়-শিল্পে-বাণিজ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করে নিয়েছে। ই রেকলাস যথার্থই বলেছেন -

> "মানুষ যে মানুষ হতে পেরেছে, সেই মানবগোষ্ঠীর পুরোটাই নারীর কাছে ঋণী, সেই গৃহের প্রতিষ্ঠাত্রী, শিল্পের স্রষ্টা। ...নারীই সভ্যতার আদি রূপকার।"[১]

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে মুসলিম নারী অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেও কালান্তরে পুরুষতন্ত্রের দাপটে নারীর ক্ষমতায়ন খর্ব হয়েছে। যে পুরুষকে নারী গর্ভে ধারণ করেছে সেই পুরুষই ক্রমে নারীর ক্ষমতা খর্ব করতে পিছুপা হয়নি।

আফসার আমেদ যেহেতু নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী তাই নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিকূল সমাজকে তিনি আঘাত করেছেন। আফসার আমেদ যে কাদা-জল মাখা গ্রামীণ সমাজ ও সময় থেকে উঠে এসেছেন, সেখানে তাঁর লেখনীর মূল বিষয় হতে পারত গ্রামীণ কৃষক-মজুর সমাজ তথা ভূমিসমস্যা। কিন্তু তিনি মুসলমান সমাজ, ধর্মীয় গোঁড়ামি তথা মুসলিম নারীর অন্তঃস্বরকে তাঁর কথাসাহিত্যে বড় করে তুলে ধরেছেন। কবি নিজেই জানিয়েছেন সে কথা -

> "জন্মগতভাবে আমি মুসলমান, আমি মুসলমান সমাজেই বড় হয়েছি। অনিবার্যভাবে আমার লেখার বিষয় হয়ে উঠেছে মুসলমান জীবন। আমি যাদের জানিনা তাদের কথা লিখব কেমন করে।"[২]

কোনো লাজ-লজ্জা বা ঢেকে-চেপে না রেখে তিনি নির্দ্বিধায় মুসলিম সমাজের জায়মান বাস্তবতাকে অনাবৃত করেছেন। ধর্মের ধ্বজাধারী, মুখোশ পরিহিত ভণ্ড মানুষদের মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মুখগুলিকে টেনে হিঁচড়ে বের করে এনেছেন তিনি।

মুসলিম সমাজজীবন বিশেষত মুসলিম সমাজের বিভিন্ন নারীর জীবনবৃত্ত নিয়ে লেখা উপন্যাস আফসার আমেদের 'অশ্রুমঙ্গল'। উপন্যাসে লেখক কয়েকটি নারীর জীবনবৃত্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গ্রামে টেলিফোনের আগমনের মাধ্যমে গ্রামের পট পরিবর্তন ঘটেছে। তা ছাড়া আফসার আমেদ তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন বহুবিবাহ, অবৈধ প্রেম, সমকামী প্রেমের মতো সামাজিক সমস্যার দিকগুলিও। মতিন মাস্টারের বাড়িতে টেলিফোনের আগমনে সে গ্রামের প্রিয় মানুষ হয়ে উঠেছে; হয়ে উঠেছে গ্রামের সবার জনপ্রিয়। গ্রামটাকে আরও ভালোভাবে চিনতে পেরেছে মতিন মাস্টার,

> "ফোন আসার পর হদিস পাওয়া যায়, কুসুমপুর গ্রামের অনেক পুরুষ মানুষ অন্য অন্য সব প্রদেশে রুটি-রুজির জন্য আছে। তারা কেউ সোনার কারিগর, কেউ সাচ্চা জরির কারিগর, কেউ ওয়েলডিং-এর কাজ করে, কেউ দরজির কাজ করে। এই কুসুমপুরের মানুষজন ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কেউ বাঙ্গালোর, কেউ গুজরাট, কেউ-বা বিলাসপুর, জব্বলপুর-নানাজন নানা জায়গায়। তারা এক-দেড় বছর অন্তর আসে। তাদের বিশেষত স্ত্রী ও মায়েরা আসে ফোন ধরতে। জননী ও স্ত্রী দুজনেরই চোখ জলে ভরে যায় প্রায়শই। কান্নার ধরন, ডুকরে ওঠার এক-একজনের এক-একরকম।"[৩]

স্বামীকে হারিয়ে বদরন বিয়ে করেছে বুড়ো হাসমতকে। কিন্তু বুড়ো হাসমতের সংসারে না থেকে জয়নালের প্রতি টান অনুভব করে হাসমতের সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছে। লালমন ও মনোয়ারা দুজনেই সংসারী, দুজনের স্বামী বিদেশে কাজ করে। তাই দুজন দুজনের ভরসা হয়ে দিনযাপন করে। দুজনের ঘনিষ্ঠতায় একজন অন্যজনকে নিজের পুরুষ বানিয়ে নিয়ে শরীরের ভার ছেড়ে দেয় অন্যজনের হাতে। হাফেজাকে তাঁর স্বামী সংসারে নেয় না। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে সে বাপের বাড়ির গ্রাম কুসুমপুরে থাকে। পুরোনো প্রেমিক নাদেরের প্রতি যখন সে টান অনুভব করে তখন স্বামী মহরম তাকে ঘরে নেওয়ার কথা জানায়। হাফেজার এরকম দোলাচালের মধ্যে উপন্যাসের আখ্যানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উপন্যাসের শুরু কুসুমপুর গ্রামে টেলিফোনের আগমনের মাধ্যমে। গ্রামে সবার নামে ফোন আসে। বিশেষ করে মেয়েদের। কারণ তাঁদের কারও স্বামী, কারও ছেলে বাইরে কাজ করে। আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয় কার কবে ফোন আসবে। মতিন মাস্টার সেই মতো সবার বাড়ি গিয়ে খবর দিয়ে আসে। এর ফলে গ্রামের মানুষের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা বেড়েছে। আগে মতিন মাস্টারকে সবাই সম্মান করত। ফোন আসাতে সে যেন গ্রামের লোকের আরও কাছের মানুষ হয়ে উঠেছে। গ্রামে ঝি, বউদের সঙ্গে মসকরা করে, পুকুর পাড়ে, মুদির দোকানে বসে সবার সাথে আড্ডা দেয়। কিন্তু তাঁর জীবনে দুঃখ একটাই, দশ বছরের বিবাহিত জীবনে সে এখনও নিঃসন্তান।

ফোন আসাতে গ্রামের মেয়েদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। যাঁদের রূপ আটপৌড়ে শাড়িতে অযত্নে চাপা পড়েছিল সে এখন রূপসী। ফোন ধরতে যেতে হবে বলে এখন মেয়েরা ভালো শাড়ি পরে, কপালে টিপ লাগায়, চোখে কাজল লাগায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 204 - 210
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কথা বলার মধ্যে তাদের এক নাগরিক স্পষ্টতা তৈরি হয়েছে। প্রিয় মানুষটার সাথে কথা বলার জন্য লাইন পড়ে যায় মতিন মাস্টারের বাড়িতে। রাতে হ্যারিকেন নিয়ে তাঁরা হাজির হয় মাস্টারের বাড়িতে। কারও সঙ্গে শ্বশুর, দেওর থাকে, কারও সঙ্গে শাশুড়ি, ননদ বা জা। প্রিয় মানুষের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। একে একে নাম ধরে ডাকে মতিন মাস্টার, একজন ফোন ধরলে ভিড় লাইনে যেন সাধারণ নীরবতা জারি হয়। প্রিয় মানুষটার অদর্শনে ফোন ধরে কথা বলার চেয়ে কাঁদেই বেশি মেয়েরা। কেউ হাসি মুখে, কেউ বা অশ্রুসিক্ত চোখে বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে মতিন মাস্টারের ডাক দেওয়া জারি থাকে। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন,

> "যার রূপ আটপৌরে শাড়িতে ও অযত্নে চাপা পড়েছিল, সে এখন রূপসী। সে নিজেকে একভাবে খুঁজে পেয়েছে। কথা বলার মধ্যে নাগরিক এক স্পষ্টতা তৈরি হয়েছে, তাও কম আকর্ষণীয় করে না তাদের। কম সময়ের মধ্যে সব কথা বলতে হবে, ...নিজের কথা সকলের সামনে বলতে পারার এই যে ব্যাপার ঘটেছে, এ যেন আর-এক স্বাধীনতা পেয়েছে।"[৪]

কুড়ি বছর সংসার করার পর বদরনের স্বামী মারা যায় ক্যানসারে। দুই ছেলে বদরনের, বড়ো ছেলে ফয়জুল বাইরে কাজ করে। আর লালটু খুব ছোটো। স্বামী হারিয়ে ছ-মাস বাপের বাড়িতে থাকলেও আর জায়গা হয় না সেখানে। রাতারাতি হাসমতের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। ছোটো ছেলে লালটুকে খুব ভালোবাসে, লহন বাপ বলে ডাকে হাসমতকে। কিন্তু বদরন বুড়ো হাসমতের সঙ্গে সংসার করতে চায় না। উঠতে-বসতে বদরন তাকে শাপশাপান্ত করে। বুড়ো বলে দুষে। বদরনের ভালোবাসা জন্মায় জয়নালের প্রতি। বদরন ভেবেছিল কিছুদিনের মধ্যে হাসমত মারা গেলে তার সম্পত্তি নিয়ে সে শহরে জয়নালের কাছে চলে যাবে। কিন্তু তা যখন হল না, তখন একদিন ভোর রাতে লালটুকে তার নতুন বাপের কাছে রেখে বদরন চলে যায় জয়নালের কাছে। হাসমত অপেক্ষা করে তার বউকে সংসারে ধরে রাখতে পারল না। কিন্তু লালটুকে বড়ো ভালোবাসে হাসমত।

ফয়জুল তার মাকে ফোন করে পনেরো দিন অন্তর। তাই ছেলের ফোন ধরার জন্য কুসুমপুরে হাসমতের কাছে ফিরতে হয় বদরনকে। ফয়জুলকে অনেকদিন দেখেনি। কারণ তাকে বাড়ি ফিরতে বললে সে জানায় ইদে ফিরবে। আবার ভোর রাতে বদরন ফিরে যায় জয়নালের কাছে। পনেরো দিন পর যখন কুসুমপুরে ফিরে আসে তখন একটি বাড়তি কাজ নিয়ে আসে জয়নালের কাছ থেকে। বাড়িতে ফিরে এসে হাসমতের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। হাসমত রাগ দেখালেও বদরন চুপ থাকে। বদরনের উদ্দেশ্য ছিল হাসমতের কাছে তালাক নিয়ে জয়নালের সঙ্গে পাকাপাকি ভাবে সংসার পাতবে। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে লেখক তুলে ধরেছেন -

> "বুড়োটা তাকে কিছুতেই ছড়পত্র দেবে না। ...এই বুড়োর সংসারে পচে মরতে হবে। এ জীবন সে চায়নি। ...জয়নাল সামাজিকতা চায়, বিয়ে চায়। বদরনকে বিয়ে করতে না পেলে মেয়ের অভাব হবে না তার। জয়নালকে ভালোবেসেই না তার কাছে চলে গিয়েছিল। সে ভালোবাসা আবার ফিরিয়ে নেবে কী করে? মেয়ে মানুষ বলে তার কি কোনো মন নেই? তা ছাড়া জয়নাল অন্য কাউকে বিয়ে করলে সইবে কী করে?"[৫]

কিন্তু হাসমত তালাক দিতে না চাইলে তখন কথা শোনাতে শুরু করে বদরন। শেষ পর্যন্ত তালাক না পেলেও জয়নালের কাছেই চলে যায় বদরন।

মাঝের পাড়ার দুই জা লালমন আর মনোয়ারা। মেজ জা ও সেজ জা তাঁরা। দুই জা-এ খুব ভাব। লালমনের বিয়ে হয়েছে বছর সাতেক আর মনোয়ারা বছর খানেক। নতুন বউ এখনও ঘোচেনি তাঁর। দুজনের স্বামীই সোনার কাজ করে। দুজনের অফুরন্ত সময়, অঢেল অবকাশ। দুজন দুজনের সাথে গল্প করে সময় কাটায়, দুজনেই তাঁরা একই দুঃখে দুঃখী। স্বামীরা না আসাতে তাঁরা যেন আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। স্বামীর বিরহে দিনরাত্রি কাটানো অসহায় দুই নারী একে অপরকে মনের বেদনার কথা শুনিয়ে শান্তি পায়। জীবন থেকে তাঁদের উৎসব, আনন্দ যেন হারিয়ে গেছে। তাই তাঁদের চাচাতো দেওরের বিয়ে উপলক্ষ্যে তাঁরা আনন্দে মেতে থাকে। এতে তাঁদের বিরহকাতরতার উপশম হয়, স্বামীদেরকে ভুলে থাকে

কয়েকদিন। তাঁরা একে অপররের সঙ্গে বাজারে যায়। স্বামীদের অনুপস্থিতিতে বাজারে গিয়ে মনের মতো জিনিসপত্র কিনে তাঁরা অন্য স্বাধীনতার স্বাদ পায়। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন -

> "স্বামীরা না থাকায় একটা সুবিধে নিজেরা হুট হাট বেরিয়ে পড়তে পারছে। স্বামীরা থাকলে তারাই এসব কিনে এনে দিত। কিন্তু বেড়ানোর এমন মজা তারা পেত না। এক স্বাধীনতার স্বাদ তারা পাচ্ছে।"[৬]

এদিকে মনোয়ারা একা ঘরে ঢুকলে তাঁর মনে হয় ঘরে যেন কোনও পুরুষ আছে। যেন তাঁর পিছনে এসে দাঁড়ায়, তাঁর গায়ে নিশ্বাস ফেলে, মনোয়ারা যেন পুরুষ মানুষের গায়ের গন্ধ পায়। সবই যেন তাঁর মনের ভুল। লালমনকে একথা জানালে মস্করা করে বলে সত্যি ঘরে সে পুরুষ ঢুকায় কি না। মনোয়ারা লালমনের ঠোঁটে চিমটি কেটে দেয়। ঠোঁট তার ছিঁড়ে গেছে জ্বালা করছে জানালে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চুমু খায়। এরপর দুজন দুজনকে চুমু খায়। ভালো লাগে তাদের; আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে পড়ে তাঁরা।

মতিন মাস্টারের বাড়িতে লালমনের ফোন আসে মাঝে মাঝে। কাজের জায়গা থেকে তাঁর স্বামী ফোন করে। কিন্তু মনোয়ারার কোনও ফোন আসে না। সে তাঁর স্বামীর মুখ ভুলে গিয়েছে। ভুলে গিয়েছে স্বামীর গলার আওয়াজ। অন্ধকার ঘরে বসে জানালা দিয়ে নবদম্পতিকে দেখে তাঁরও মনে মনে কামনা জাগে। নিজের চাহিদা পূরণের জন্য মেজজা লালমনকে রাতে তাঁর ঘরে ডেকে নেয়। রাতের অন্ধকারে দুজনের ঠোঁট চুমুর প্রত্যুত্তরে চুমু দেয়। একে অপরের হাত শরীরের অভ্যন্তরে খেলা করতে চায়। যেন পোশাক খুলে আসতে চায় তাঁদের শরীর থেকে। উদ্দাম হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। একজন অন্যজনের পুরুষ হতে চায়। শরীরের ভার ছেড়ে দেয় একজন আরেকজনের হাতে। শরীরে শরীর নিয়ে খুশি থাকে তাঁরা।

হাফেজা বড় অদ্ভুত মেয়ে। স্বামী মহরম দ্বিতীয় বিয়ে করায় দশ বছরের ছেলেকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ির গ্রাম ছেড়ে চলে আসে। বাপের বাড়িতে ছোট্ট চালায় মা-ছেলেতে থাকে। স্বামীর প্রতি মন তাঁর মরে গেছে। গ্রামের মানুষের কাছে চেয়েচিন্তে খাওয়া তাঁর স্বভাব। একটা ছেঁড়া শাড়ি পরে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়। মান-অপমানের কথা সে ভাবে না। অযত্ন-মলিনতায় লুকিয়ে রেখেছে তাঁর লাবণ্য, যৌবনের রৌদ্র। মনটাকেও সেরকম মলিন করে রেখেছে। স্বামী তাকে নেবে না জেনেও সে চেয়েছে গ্রামের সবার মতো তাঁরও একবার ফোন আসুক। তাঁরও ফোন এসেছে। এর মাঝে তাঁর খালের পাড়ে দেখা হয় তাঁর পুরোনো প্রেমিক নাদেরের সঙ্গে। নাদের হাফেজাকে দেখে তাঁর প্রতি আবার দুর্বল হয়ে পড়ে। নাদের চেয়েছিল তাঁর সঙ্গে পুরোনো কিছু প্রেমের কথা বলবে। কিন্তু হাফেজা বড়ো বেহায়া মেয়ে। কিছু সব্জি ও একশো টাকা চেয়ে সে বাড়ি চলে এসেছে। নাদেরের মনের কথা শোনেনি হাফেজা। বাড়ি ফিরে এসে চৈতন্য ফিরে তাঁর। স্বামী তাঁর নেই। নাদেরের প্রেম বাঁচিয়ে রাখত তাকে। কিন্তু সেই সুযোগও সে একশো টাকার লোভে হাত ছাড়া করেছে।

এর পরেই চরিত্র-মননে পরিবর্তন আসে হাফেজার। লোকের বাড়ি বাড়ি আর চেয়ে খায় না। নিজেকে গুছিয়ে রাখতে শিখেছে এখন। নাদেরের ভালোবাসার প্রত্যাশী এখন সে। কিন্তু তার কাছে যাওয়ার মতো মুখ তাঁর নেই। কিন্তু নাদেরের ভালোবাসার আশায় সে নিজেকে তৈরি করেছে। পুনরায় সাহস জুগিয়ে সে নাদেরের কাছে গিয়েছে। সংসারী নাদেরও তাঁদের ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু সেই সময় মহরম জানায় সে হাফেজার প্রতি অবহেলা করেছে, অন্যায় করেছে। সে তাকে ফিরিয়ে নিতে চায়। বড়ো দোলাচলে পড়ে হাফেজা। কান্না তাঁর উৎলে উঠতে থাকে। এরকম এক পরিস্থিতির মধ্যে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

আফসার আমেদ 'অশ্রুমঙ্গল' উপন্যাসে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা তুলে ধরেছেন। গ্রামের রাস্তা-ঘাট, কর্মসংস্থান না থাকলেও এক ফোনের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার ধরনের যে পরিবর্তন ঘটেছে তা-ই তুলে ধরা হয়েছে উপন্যাসে। তা ছাড়া তিনি বহুবিবাহ, অবৈধ প্রেম, সমকামী প্রেমের মতো সামাজিক সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে তিনি চারজন নারীর তিনটি পৃথক ঘটনাকে দেখিয়েছেন। গ্রামের মতিন মাস্টারের বাড়িতে ফোন আসায় সে হয়ে ওঠে গ্রামের সকলের কাছের মানুষ। গ্রামে কার কবে ফোন আসবে তা লিখে রেখে ঠিক মতো খবর দিয়ে আসে। কারণ এখানে তার ব্যবসায়িক ফায়দা লুকিয়ে আছে। প্রতিটি ফোন পিছু দশ টাকা করে পায় সে। গ্রামের পরিবারের সঙ্গে মাস্টারের পরিবারের শিক্ষা-দীক্ষা, জীবনযাত্রার বিস্তার ফারাক সত্ত্বেও তারা মাস্টারের সঙ্গে মিশতে পারে তার সরলতার জন্য। ফোন আসার

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 204 - 210
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আগে মাস্টার তাদের কাছে শুধুই মাস্টার ছিল কিন্তু গ্রামের মানুষের কাছে এখন মাস্টার শুধুমাত্র একজনের নাম, একজন মানুষ।

ফোন ধরতে আসা সকলেই নারী। কারণ গ্রামে কাজের অভাবে তাঁদের কারও স্বামী, কারও ছেলে বাইরে কাজ করে। এই ফোন-ই গ্রামের মানুষকে জুড়ে দিয়েছে বহির্বিশ্বের সঙ্গে। কাউকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার খবর, কারও বাচ্চা হলে খবর, কারও বিয়ের পাকা দেখার খবর সবই এই ফোনের মাধ্যমে মানুষ আজ পেয়ে যাচ্ছে। গ্রামের যেসমস্ত মেয়েরা নিজেদের এতদিন অগোছলো করে রেখেছিল আজ তাঁরা পরিপাটি হতে শিখেছে। ভালো শাড়ি, মাথায় তেল দিয়ে নিজেদের সাজায় এখন তাঁরা। কিন্তু গ্রামের খরা-বন্যা, অশিক্ষা অপুষ্টি কিছুই বদলাতে পারেনি টেলিফোন। টেলিফোনের বদলাবার কথাও নয়। টেলিফোন যা পেরেছে তা হল কুসুমপুরের মানুষের মানস পরিবর্তন। গ্রামের মানুষের চরিত্র, জীবনযাত্রা, দুঃখ-কষ্ট সব কিছু ভাগাভাগি করে দিয়েছে টেলিফোন। গ্রামজীবনের পটপরিবর্তনের মূল কান্ডারি হিসেবে তুলে ধরেছেন টেলিফোনকে।

আফসার আমেদ উপন্যাসে যে চারজন নারীর কথা তুলে ধরেছেন তাঁদেরই একজন বদরন। উপন্যাসের এই অংশে সমাজের বহুবিবাহ, অবৈধ প্রণয়ের দিকটি দেখিয়েছেন। কুড়ি বছর সংসার করার পর বদরনের স্বামী ক্যানসারে মারা যায়। ছোটো ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিলেও বিধবা ননদের ভাতের ভার নিতে অস্বীকার করে ভাজেরা। পারিবারিক সমস্যাগুলিকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই, পরিবারের এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে রাতারাতি বুড়ো হাসমতের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে বাড়ির লোক। ছোটো ছেলে লালটুকে নিয়ে বুড়ো হাসমতের সংসারে গেলেও সংসারের প্রতি বদরনের মায়া তৈরি হয় না। কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলে নতুন করে বাবা পাওয়াতে নিজেকে সুখী মনে করেছে। বদরনের সংসারের প্রতি নয়, বরং স্বামীর সম্পত্তির প্রতি লোভ, লালসা দেখা যায়। স্বামীর মৃত্যু-কামনা করতে কুণ্ঠা বোধ করেনি সে। স্বামী-সংসারের প্রতি বিরূপতার কারণ হিসেবে ঔপন্যাসিক বিবাহ-বহির্ভূত অবৈধ প্রেমকে দেখিয়েছেন। জয়নালের প্রতি এক টান অনুভব করে বদরন। সেই টান থেকেই সমাজকে, নিজের লাজ-লজ্জাকে উপেক্ষা করে সন্তান ও বৃদ্ধ স্বামীকে ফেলে রেখে পালাতে পেরেছে। যেন অভিসারের ডাক পড়েছে তাঁর। রাতের অন্ধকার থাকতে সমস্ত প্রতিকূলতাকে এড়িয়ে সে চলে গিয়েছে জয়নালের কাছে। কিন্তু মাতৃত্বকে উপেক্ষা করতে পারেনি বদরন। তাই বারবার তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছে কুসুমপুর গ্রামে। দুশ্চিন্তা করেছে লালটুর জন্য।

বড়ো ছেলে ফয়জুলের সঙ্গে কথা বলে অঝোরে চোখের জল ফেলতে দেখেছে পাঠক বদরনকে। বড়ো ছেলের সাথে কথা বলার জন্য হাসমতের সংসার তাঁর সংসার। হাসমত তাঁর স্বামী। এ যেন স্বার্থপরতার এক চিত্র পাঠকের চোখে ধরা পড়ে। দ্বিতীয়বার কুসুমপুরে বদরন ছেলের সাথে কথা বলার পাশাপাশি এক স্বার্থ নিয়ে আসে। সে চায় হাসমতের কাছে তালাক নিয়ে জয়নালের সাথে পাকাপাকি ভাবে সংসার গড়ে তুলতে, জয়নালের প্রেমকে স্বিকৃতি দিতে। কিন্তু হাসমতও চায় বদরন তাকে ভালো না বাসুক অন্তত তার সংসারে থাকুক। তাই সে তালাক দিতে রাজি হয় না। কিন্তু বুড়ো স্বামীর সংসার করতে চায় না বদরন। আরও একবার শেষবারের মতো সে চলে গিয়েছে জয়নালের কাছে। হাসমত তাকে ধরে রাখতে পারেনি সংসারে।

উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন এক সমকামী প্রেমকে। সমলিঙ্গের প্রতি যে যৌন আকর্ষণ বা যৌন আকর্ষণের যে একটি স্থায়ী কাঠামো বিন্যাস সেই বিষয়টি লালমন ও মনোয়ারা চরিত্র দুটির মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। লালমন ও মনোয়ারা সমকামী হয়ে উঠেছে তাদের স্বামীর অনুপস্থিতির অভাবে। দিনের পর দিন একা থাকায় নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা বলে নিজেদের মাঝে ঘনিষ্ঠ হয় তারা। দুজনের সম্পর্কে এগিয়েছে প্রথমে মনোয়ারা। এর পেছনে যে কারণ তুলে ধরা যেতে পারে তা হল মনোয়ারার স্বামীর ফোন না করা। স্বামীর কণ্ঠস্বর এমনকি স্বামীর মুখ পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে সে। লালমনের মাঝে মাঝে স্বামীর ফোন আসে। স্বামীর সঙ্গে কথা বলে অশ্রুধারা ঝরিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। স্বামীরা বাড়ি ফেরে না। এদিকে সদ্য বিবাহিত নতুন দেওর ও তার বউকে রাতের অন্ধকারে জানালা দিয়ে দেখে মনোয়ারা। এতে তাঁর জৈবিক কামনা আরও বেড়ে যায়। মনোয়ারা লালমনকে যে শারীরিক মিলনের ডাক দিয়েছে তাতে সাড়া দেয় সেও। দুজনে সেজে গুজে বিছানায় আসে, একে অপরকে নিজেদের পুরুষ ভাবে। নিজেদের শরীর তুলে দেয়

একে অপরের হাতে। সমকামী প্রেমকে সমাজে ঠিক চোখে দেখে না। ঔপন্যাসিক এখানে এই প্রেমকে শুধুমাত্র পাঠকের কাছে তুলে ধরছেন সমাজের চোখে আড়াল রেখে।

ঔপন্যাসিক হাফেজা চরিত্রের দুটি দিককে তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। উপন্যাসের প্রতিটি নারীর মতো হাফেজারও অশ্রু ঝরানো কাহিনি তুলে ধরেছেন লেখক। বহুবিবাহের মতো সামাজিক সমস্যার দিকটাও তুলে ধরা হয়েছে। আবার প্রেমের মধ্য দিয়ে চরিত্র ও মননের যে পরিবর্তন সেটিও দেখিয়েছেন উপন্যাসে। হাফেজার স্বামী মহরম দ্বিতীয় বিয়ে করে হাফেজাকে সংসার থেকে বার করে দিয়েছে। বছর ত্রিশের যুবতী হাফেজা নিজেকে উলুডুলু করে রাখতে ভালোবাসে। লোকের কাছে চেয়েচিন্তে খাওয়া এমন তাঁর স্বভাব হয়ে উঠেছে। নিজের সৌন্দর্যকে ছেঁড়া শাড়ি ও জট পাকানো চুলের আড়ালে লুকিয়ে রাখে। স্বামীবিরহ নয় বরং একাজ তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়েছে। নাদের শমের যুবকের সঙ্গে তাঁর প্রণয় ছিল, কিন্তু দুই পরিবারের রেষারেষিতে তাদের বিবাহ হয়নি। বারো বছর পর নাদেরের কাছে আবার সুযোগ পেয়েও টাকার লোভে তা হাত ছাড়া করে হাফেজা। পরে সেই ভুল বুঝে আক্ষেপে ফেটে পড়ে হাফেজা, নিজেকে দোষী করে সে। নিজের এই ভুল বুঝতে পারা মনন তাঁর চরিত্রের পরিবর্তন করে। লোকের কাছে চেয়ে খাওয়ার স্বভাব এখন তাঁর বদলেছে। নিজেকে সাজিয়ে রাখতে শিখেছে নাদেরের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য। যে কথা না শুনে নাদেরের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল, নাদেরের কাছে সে কথাই শুনতে চায় হাফেজা। ভালোবাসা কীভাবে মানুষের পরিবর্তন ঘটিয়েছে তা দেখেছে পাঠক। নাদেরের কাছে আবারও ফিরে গিয়েছে হাফেজা, পুরোনো প্রেমের বলে শান্তি পেয়েছে দুজনে। এ ক্ষেত্রে হাফেজার মনের ভেতরের কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপন্যাসের আখ্যানে তুলে ধরেছেন লেখক -

> "পুরুষ মানুষের সাধের হাতে তাকে পড়তেই হবে।...নাদেরের প্রেম পেয়েছে এই আনন্দেই থাকতে চেয়েছে সে। সেই আনন্দে গোপনে মজে থাকতে চেয়েছে। আর কিছু চায়নি। আর কিছু নয়।"[৭]

দু'জন দু'জনের সঙ্গে সংসার করতে চাইনি। শুধু দুজন দুজনের ভালোবাসা নিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু নিয়তি সেই সুখও কেড়ে নিয়েছে হাফেজার কাছ থেকে। যখন সে বাঁচার অর্থ খুঁজে পেয়েছে তখনই স্বামী পরিত্যক্ত হাফেজাকে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে স্বামী মহরম। কাঁদে হাফেজা। হাফেজার জীবনে দুঃখ যেন আবারও মায়া ঘেরা দিয়ে ওঠে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারার আদল বদলে যায়। এক একটা নতুন উদ্ভাবন মানুষের বেঁচে থাকার সংজ্ঞাটাই পাল্টে দেয়। কুসুমপুর গ্রামে টেলিফোন আসাতে তাই হয়েছে। তারা যেন মুহূর্তে গোটা বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের এই বদলে যাওয়ার গল্পই বলেছেন আফসার আমেদ,

> "...তাদের সন্তানেরা থাকে দূরে, তাদের স্বামীরা থাকে দূরে। ...অদর্শনে কাঁদবে, বিরহ-ব্যথায় কাঁদবে যেন কান্নাগৃহ এটা।"[৮]

সেই বদলের সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের কথা বলেছেন। গ্রামের মেয়ে, বউদের চোখে অশ্রু ঝরার গল্প বলেছেন। প্রতিটি মেয়ের অশ্রু ঝরার ভিন্ন ভিন্ন গল্প তিনি শুনিয়েছেন। দশ বছরের বিবাহিত জীবনে মতিন মাস্টারের স্ত্রীর নিঃসন্তান হওয়ায় প্রতি রাত্রে একা একা তাঁর স্ত্রীকে কাঁদতে দেখি আমরা। সংসারে অসুখী বদরনকে ছেলের জন্য কাঁদতে দেখা যায়। লালমন, মনোয়ারা যাদেরকে ভরসা করতে চায় তারা আজ দূরে। কেবল ওই টেলিফোন তাঁদের গলার স্বরটুকু চিনিয়ে দেয়। তাই ফোন ধরে কেবলি তাঁরা কাঁদে। হাফেজা যখন নাদেরের ভালোবাসা পেয়ে নিজেকে সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করে তখনি তাঁর স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে চায়। হাফেজা দুঃখে কাঁদে, আনন্দে কাঁদে,

> "হাফেজা ভাবছিল ফোনটা না আসায় ভালো। স্বামী তার কাছে যেমন নিরুদ্দেশ তেমনি থাকত। ফোন করতে ভুলে যাবে। যেতেই পারে ভুলে। তা হলে ভালো হয়। কেমন স্বাধীনতার স্বাদ তাতে। ...স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেবে, এই নিষ্ঠুরতায় কাঁদে। স্বামী ভাবে ...এখন ফিরিয়ে নিচ্ছে, সেই আনন্দে কাঁদছে। হাফেজা কাঁদতেই থাকে, কথা বলতে পারে না, কান্না তার উথলে উঠতে থাকে।"[৯]

বদরন, লালমন, মনোয়ারা, হাফেজার জীবনের গল্পগুলো বিষাদময়। উপন্যাসে এমন এক সময়ের কথা বলা হয়েছে যেখানে সময়ের অনুষঙ্গ হয়েছিল টেলিফোন। আর আমরা যারা স্মার্টফোনে অভ্যস্ত তারা বুঝবেন, ওই পাঁচ মিনিট বদরন, লালমন,

হাফেজাদের জন্য কতটা আকাঙ্ক্ষিত ছিল। আফসার আমেদ নিজের মতো করে টেলিফোন ঘিরে নারীর জীবনের দুঃখগাঁথা তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন তাদের অশ্রু ঝরানো গল্প। অদ্ভুত বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে উপন্যাসে গড়ে তুলেছেন বাস্তবতা। এত কথার পরেও বলা যায় ঔপন্যাসিক আফসার আমেদ যুগ যুগ বাহিত নারীর শাশ্বত প্রেম-প্রত্যাশার স্বাভাবিক চিত্রই বর্তমান উপন্যাসে অঙ্কন করেছেন। যৌবধর্মে অভিষিক্ত এ প্রেম মাটি পুষ্ট। সামাজিক নানা বস্তু চিত্রণের আনুষঙ্গিকতাকে অতিক্রম করে চার নারীর প্রেম অনুধ্যানই উপন্যাসে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। বৈষ্ণব কবিতা অনুভবের তুরীয় মার্গে তথা অতীন্দ্রিয় প্রেমের রাজ্যে আমাদের নিয়ে গেলেও তার মানবিক আবেদনকে আমরা অঙ্গীকার করতে পারি না। রাধা প্রেমের যে তত্ত্বই আমরা আনিনা কেন ঘরে সে নপুংসক স্বামী আইহনকে উপেক্ষা করে ছিল এটা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। আমাদের নায়িকারা পুরুষের বস্ত্রালিঙ্গনে স্বামী সোহাগি হয়েই সংসারে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতির প্রতিকূলতা তাতে বাধা দিয়েছে। বিধবা বদরনের বিয়ে হয়েছে বৃদ্ধ হাসমতের সঙ্গে, তাই জৈব প্রেমের স্বাভাবিক টানেই জয়নালের প্রতি আকর্ষণে তার প্রেমের ঘৃতাহূতি।

লালমন মনোয়ারার স্বামীরা প্রবাসে। দীর্ঘ বিরহ তাপিত হৃদয়ে তাঁদের স্বামী মিলন সুখ অচরিতার্থ। মনোয়ারা তো স্বামীর মুখ পর্যন্ত মনে করতে পারছে না। অনুকূল পরিবেশে অসঙ্গ লিপ্সার অমোঘ টান দুই নারীকেই পরস্পরের পরিপূরক করে সমকামিতায় ঠেলে দিয়ে তাঁদের প্রেম শুধু চরিতার্থ করার বন্দোবস্ত করেছে।

হাফেজা স্বামী পরিত্যক্তা। প্রেম বঞ্চিতার অভিমানে সে মলিনতার আবরণে তাঁর প্রেমের অগ্নিশিখা ছাই চাপা দিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু কতদিন? তার আবরণ মুক্তি তো অনিবার্য। তাই নাদেরের প্রেমের স্বাদ পাওয়া হাফেজা বিয়ে না করে তাকে নিয়ে বিবাহবর্হিভূত সম্পর্কে থাকতে চায় এবং প্রেমের চরম আনন্দ অনুভব করতে চায়। কিন্তু তাঁর সে স্বপ্নও ব্যর্থ হল নিয়তির নিষ্ঠুরতায়। স্বামী মহরম আবার তাকে ফিরিয়ে নিতে চায়। তাঁর চাওয়াকে ভুল প্রতিপন্ন করে চোখের জলই যেন তাঁর জীবনের সঙ্গী হল।

চারজন নায়িকাকে নিয়েই ঔপন্যাসিক শাশ্বত প্রেম জিজ্ঞাসার অবতারণা করলেন। কিন্তু চরিতার্থতার বন্দোবস্তে লেখনী পথ মসৃণ করতে পারলেন না। এ যেন ব্যর্থ প্রেমের অশ্রুসজল পালাগান। 'অশ্রুমঙ্গল' নামকরণের মাধ্যমে লেখক মঙ্গলকাব্যের আনুষঙ্গিকতায় প্রাচীনতার ঐতিহ্যেবাহী নারীর শাশ্বত প্রেমক্ষুধার কথাই ব্যঞ্জিত করেছেন। মঙ্গল শব্দে মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করতে লেখক তাঁর উপন্যাসে অশ্রুলবণাক্ত প্রেম মাহাত্ম্যকেই প্রতিপাদ্য করেছেন। 'অশ্রুমঙ্গল' আসলে নারীর ব্যর্থ প্রেমের দীর্ঘশ্বাস ও গৌরবগাঁথা।

Reference:

১. সাইয়্যেদা কানিজ মুস্তাফা, *ইসলামে নারীর অধিকার,* কলকাতা : বাণী প্রকাশ, ১৯৬৫, পৃ. ১

২. মোস্তাক আহমেদ, *সাহিত্যিক আফসার আমেদ একান্তে কিছুক্ষণ, গাধা সংকলন,* কলকাতা : উলুবেড়িয়া, ২০১৭, পৃ. ২৪২

৩. আফসার আমেদ, *অশ্রুমঙ্গল,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ১০

৪. তদেব, পৃ. ১২

৫. তদেব, পৃ. ৭০

৬. তদেব, পৃ. ৭৩

৭. তদেব, পৃ. ৯৪

৮. তদেব, পৃ. ৯৫

৯. তদেব, পৃ. ৯৬